প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩

পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৪

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও জগৎ প্রিন্টার্স (প্রাইভেট) লিঃ, ১০৩ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে সি. সি. রায় চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত

কবিশেখর

শ্রীকালিদাস রায়

করকমলে

এই পর্যায়ের সবগুলি কাবতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইল। প্রুফ-সংশোধনে কবিবন্ধু শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকটে আমার ঋণ অপরিশোধ্য হইয়া রহিল।

হংসমিথুন

যুগল

পুরাতন এ পৃথিবী,
পুরাতন আমার হৃদয়।
স্মৃতির গোধূলিক্ষণে
অকস্মাৎ দুজনার এ কি পরিচয়!
শারদ সোনার স্বচ্ছ চীনাংশুকতলে
নবতন দৃষ্টিবিনিময়।

দুস্তর শতাব্দী কত এলো সন্তরিয়া
অমর গোলাপ,
আদিতম দম্পতির পুষ্পিত প্রলাপ্;
যুগান্তের বীথি বহি এলো উচ্ছ্বসিয়া
কুহুস্বর স্বপ্নগীতিময়।
পুরাতন এ পৃথিবী,
পুবাতন আমার হৃদয়।

পুরাতন এ পৃথিবী,
পুরাতন আমার হৃদয়।
দুজনেরি চোখে জল
করিতেছে টলমল;
আমার এ গান নহে,
ওর গালে সন্ধ্যাতারা নয়।
পুরাতন এ পৃথিবী,
পুরাতন আমার হৃদয়॥

১৯৩৭

পদ্মার চর

পদ্মার নতুন চরে কচি কাঁচা ধান,
প্রভাত অম্লান,
হায় ভগবান!
নশ্বর ঘাসের বুকে কৃষ্ণচূড়াটির
ছায়াটি গভীর,
চুম্বনমন্দির।
বৈশাখী আমের বনে মসৃণ পল্লব,
সুপ্তিমৃদু রব
স্বপনদুর্লভ।
ওপারের চর হতে কোকিলের গান,
শিশিরের ঘ্রাণ,
হায়, হায় ভগবান॥

১৯৩১

বর্ষার পদ্মা

দুরন্ত পুরব বায়ে পদ্মা উতরোল,
কাঁদে হায় হায়।
তটের মনের কথা তটিনী আজিকে
জানিবারে চায়।
অশান্ত তরঙ্গদোলে ক্ষুদ্র ডিঙিখান
করে টলমল,
কে বল রে জাগাইল সুপ্ত নদীজল
এমন সন্ধ্যায়!
আউশের ক্ষেত্র মাঝে কৃষাণ বালক
তৃপ্ত নিজ গানে,
বুভুক্ষু তরঙ্গদল লক্ষ শির হানে
তটিনীর পায়।
বৃষ্টিলুপ্ত নদীচরে পাপিয়ার স্বর
একান্ত নিশিত,
ম্লান ঝাউশাখা হতে অজস্র সংগীত
বেদনার প্রায়।
কে কারে মনের কথা বলিছে এখন,
কে কারে শুধায়?
কাঁদে পদ্মা, কাঁদে তীর শ্রাবণবন্যায়,
হায় হায় হায়॥

১৯২৭

নির্জন পদ্মা

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ,
নীলাভ পদ্মার ধারা, শূন্যতা অগাধ।
স্তিমিত হাঁসের দল,
পশ্চিম বনান্ততল
ম্লান কাঁদ-কাঁদ ;
শূন্যতা অগাধ।

শুধু দুটি মুগ্ধ প্রাণী,
শূন্য শরবন,
পদ্মার নাহিকো বাণী—স্বপননির্জন।
অসীম রাত্রির পানে
যায় তারা কোন্ খানে
ছায়ার মতন ;
স্বপননির্জন॥

১৯৩১

মধ্যাহ্নের পদ্মা

শীতের মধ্যাহ্নে আজি স্বপ্নরস ঢালি
তীরে নীরে কে রচিল এমন নিদালি
হে পদ্মা তোমার।
ওপারের ভাঙা তটে ছায়াখানি নীল
চাক বেঁধে ওড়ে আর ডাকে শঙ্খচিল
কেন বারে বার।
পীতাভ বালুর রেখা, নীলাভ স্রোতের,
স্বর্ণাভ ঘুমের ঘোর পউষ রোদের
ছু প্পারে বিথার।
শস্যকাটা শূন্য মাঠে বায উঞ্ছলোভী,
এপারের রিক্ত মাঠে দেয় মুগ্ধ কবি
স্মৃতিতে সাঁতার।

সব তব রূপ গান আজিকে নিঃশেষে
এসে যেন ঠেকিয়াছে করুণ চিত্রে সে
একটি রেখার
সূক্ষ্ম তূলিকার,
হে পদ্মা তোমার॥

১৯৩২

সূর্যাস্তের পদ্মা

হে পদ্মা তোমার
বনরেখা-বিবর্জিত দিগন্তের দেশে
ডুবে যায় শ্রান্ত রবি গলিয়া নিঃশেষে
বিন্দুমাত্রসার।
নিশ্চপল জলতলে যেন একটানা
ধূমল পাটল এক বাদুড়ের ডানা
হতেছে বিস্তার।
পশ্চিমে ত্রিবলী বর্ণ, কানন নিবিড়,
মুহুর্মুহু স্বচ্ছ ছায়া হতেছে গভীর,
নৃত্যশীল ভঙ্গী যেন লঘু ওড়নাটির
বিদ্যুৎপর্ণার,
হে পদ্মা তোমার।

নদীতে শেহলা শ্যাম, রোদে-পোড়া ঘাস,
দগ্ধ মাঠে উঠিতেছে উদ্ভিজ্জ সুবাস
শিশিরের স্পর্শ লভি ; বিমূঢ় বাতাস
গন্ধে আপনার,
হে পদ্মা তোমার।

ধূমাঙ্কিত পল্লীপথে ঘণ্টা গোধূলির,
তালে তালে দাঁড়-ফেলা ক্বচিৎ তরীর,
হঠাৎ শ্রবণে পশে কুলায়-অধীর
ধ্বনি বলাকার—
বালুস্তূপে মগ্ন দীর্ঘ মাস্তুলের শিরে
দেখিনু জ্বলিছে দীপ্তি আসন্ন তিমিরে
সন্ধ্যাতারকার,
হে পদ্মা তোমার॥

১৯৩২

শীতের পদ্মা

পুরানো দিনের পায়ের চিহ্ন খুঁজি এই নদীতটে
আজি চলিয়াছি বটে।

সেই পথঘাট, ধান-কাটা মাঠ
শীত-সন্ধ্যায় ধূসর বিরাট,
পদ্মার চর,—পদ্মা ভরাট
স্তিমিত মন্ত্র গায় রে,
হায় রে জীবন, হায় রে,
যে পথে দুজনে যায় রে
চরণ-চিহ্ন থাকে না, রাখে না
ক্ষুব্ধ ক্ষণিক বায় রে।
হেরি চারিধারে আঁধার ঘনায়,
শুধু দিগন্তে অস্তসীমায়
ঝামা আলোটুকু মিলায় মিলায়
মেঘে আর কুয়াশায় রে,
হায় রে জীবন, হায় রে,
যে পথে দুজনে যায় রে
চরণ-চিহ্ন থাকে না, রাখে না
ক্ষুব্ধ ক্ষণিক বায় রে।

পীতাভ বালুর তীরেতে শয়ান
পদ্মার আজি স্বপ্ন-প্রয়াণ,
ধ্যানে নেহারিছে তারকাটি ম্লান
ধরিল কি'রূপ হৃদয়াকাশে।

পল্লীর শিরে বেণুবন-ছায়
ধূম্রকুণ্ডলী শয্যা বিছায়,
শেষগাড়ি ধান গৃহমুখে যায়,
আর্ত করুণ শব্দ আসে।

হায় রে জীবন, হায় রে,
যে পথে দুজনে যায় রে
চরণ-চিহ্ন থাকে না, রাখে না
ক্ষুব্ধ ক্ষণিক বায় রে॥

১৯২৯

অপরাহ্ণের পদ্মা

একদিন এই পথে তুমি আর আমি।
শীতের অন্তিম রোদ দীর্ঘ ডানা ভরে
পড়ে ছিল অন্তহীন আলস্যের ভরে,
কচি মটরের ক্ষেত, সবুজ মশুর,
এপারে ওপারে পদ্মা, মাঝে এই চরে
রাত্রি আসে নামি,
তুমি আর আমি।
একদিন এই পথে তুমি আব আমি।

শীতের নূতন চবে তব দুটি পায়
সম্মুখে চলিতে পিছে ছাপ রেখে যায়,
তখনো লাগিয়া ছিল গত বরষার
ভেসে-আসা খড়কুটা , জল নাই আব ,
মাঝখানে সরু আল, দুই ধাবে তাব
শস্যহীন ভূমি,
একদিন এই পথে আমি আব তুমি।

একদিন এই পথে তুমি আব আমি।
এপাবেব গৃহবাজি, ওপাবের বন
আসন্ন কুহেলি তলে হল নিমগন,
পশ্চিম সীমান্তশেষে বিন্দুমাত্রসাব
ডুবে গেল নিঃস্ব ববি, ম্লান কুয়াশার
বাঙাইয়া পাড়খানি বাত্রি এলো নামি।
তুমি আব আমি।

আজি বহুদূর হ'তে বহুদিন পরে
একবার তাকাইনু শূন্য সেই চরে—
শূন্য মাঠ শস্যহীন, শুষ্ক বালুকায়
অতীতের স্মৃতিচিহ্ন কোথা সে প্রান্তরে!
এপারে ওপারে পদ্মা, রাত্রি আসে নামি।
একদিন এই পথে তুমি আর আমি॥

১৯২৯

সন্ধ্যার পদ্মা

সোনার দিগন্তে, সখা, একখানি পাল,
একখানি শশিকলা সন্ধ্যাতারা সাথে,
আর বন্ধু তুমি।
কপোত-পাণ্ডুর ছায়া নামিছে পদ্মাতে,
থামিছে স্রোতের ধ্বনি, ঢাকিছে বিশাল
গাঢ় মর্ত্যভূমি,
আর বন্ধু তুমি।
আকাশে হাঁসের দল দীর্ঘ গ্রীবা ভরে,
দীর্ঘতর ছায়া হানে তৃতীয়ার চাঁদ,
তুমি বন্ধু কোথা?
দুইটি বক্ষের মাঝে স্তব্ধতা অগাধ,—
অনন্ত ধ্যানের মতো দুইটি অন্তরে
ব্যগ্র ব্যাকুলতা—
তুমি বন্ধু কোথা!
আভাসে উজ্জ্বল হল চাঁদের গোলক,
মুমূর্ষু আলোর প্রান্তে রহিয়া রহিয়া
সন্ধ্যাতারা কাঁপে।
তোমার পরশ বন্ধু অম্বর ব্যাপিয়া,
বিরহী ভুবন রচে বেদনার শ্লোক
বিচ্ছেদের তাপে
সন্ধ্যাতারা কাঁপে॥

১৯২৮

ঊষা

দিগ্‌বধূ স্বপনে হাসে,
মৃদুপদে ঊষা আসে,
চরণতরঙ্গ তার লাগে দূর পূবাকাশে।
স্ফুরিত-কমল-রবে
জাগিল বলাকা সবে,
ঝলিল ধূসর ডানা শিশিরের গৌরবে !
নদীতে শীতল ধারা,
কানন মর্মরহারা,
ঊষার দুয়ার ধরি কাঁদে হের শুকতারা।
মেঘের সীমানাগুলি
লভিল কাহার তূলি !
সুরবালা ছুঁড়িল কি পারিজাত-ফুলধূলি ?
কোমল ধানের ক্ষেতে
পীত আলো ওঠে মেতে,
উদাসী শুকের ডানা চায় যেন উড়ে যেতে।
রজনীর অশ্রুকণা
নিমেষেই হল সোনা,
শচীর মাল্যের লাগি কুড়াইল দিগঙ্গনা।
মন্দাকিনী বহে ধীরে,
তারকা-বন্ধুর তীরে
হাঁসের পালক সম শীর্ণ শশী প'ল ছিঁড়ে॥

১৯২৮

সন্ধ্যাতারা

পথভোলা যত মৌমাছিদলে নীড়ে ডেকে-আনা
সন্ধ্যাতারা,
তব পরিচয় জানে জানে যত কিশলয়ভোজী
হাঁসের ডানা।
ছেয়েছে আকাশ লাল নীল পীতে,
তাহারি প্রান্তে কাঁপিতে কাঁপিতে
নিশিত চাঁদের খড়্গ যে হাতে,
তবু কেন হেন লাজুক-পারা
সন্ধ্যাতারা।

গোধূলিগভীর তন্দ্রার কূলে পা টিপিয়া এসে
সন্ধ্যাতারা
আপন লাজের আড়াল টানিয়া কেন হেন যাও
নীরবে ভেসে।
কালপুরুষের খর তরবার
দেখা দেয় ছেদি নিবিড় আঁধার,
বাদামী ধূসর হয়ে আসে ধীরে
গিরি গ্রাম বন নদীর ধারা,
সন্ধ্যাতারা।

হৃদয়ের তুমি চৌকাঠ হতে হাতছানি দিয়ে
সন্ধ্যাতারা
স্বপনক্ষণিক বাসনার দল কেন বলো তুমি
দাও জাগিয়ে ?

সারা নিশি মোর অশ্রুজাগর
আপনারে লয়ে গোপন বাসর,
একটি তুখের পথ বেয়ে আসে
লাখো তুখস্মৃতি বাঁধনহারা।
সন্ধ্যাতারা॥

১৯১৮

শৈশবের চাঁদ

শৈশবে জানালা হতে দেখেছি তোমারে,
ভাবিয়াছি তুমি শুধু মাঠের ওপারে
আকাশের ধারে।
তোমারে ধরিব ব'লে করিয়াছি পণ,
স্বপ্ন মোর সত্য হবে, করেছি মনন
দুর্লভ আশায়।
আজি জানিয়াছি সত্য, তাই বক্ষে বাজে
কত শত মাঠ ঘাট হায় রে বিরাজে
আমাদের মাঝে।
অকস্মাৎ সরে গেছ স্বপ্ন-পরপারে
তাই আজি ক্ষুদ্র বাহু কঠিন ধিক্কারে
ফিরে আসে হায়
বিড়ম্বনায়॥

১৯২৮

দ্বাদশীর চাঁদ

দ্বাদশীর চাঁদ, আর কোকিলের গান ।
ভরন্ত পদ্মাব বারি
কূলের হৃদয় কাড়ি
ছোটে কলস্ববে ;
শিথিল স্বপন প্রায়
একখানি তবী তায়
ধায় পাল ভবে ।
সহসা শুনিল কান, হেবিল নয়ান,
দ্বাদশীব চাঁদ আব কোকিলেব গান ।

মূষিক ধূসব জলে
স্তিমিত আলোক ঝলে,
ম্লান বনবেখা,
বাতাসে কবিয়া ভব
পঁহুছিল ক্লান্ত স্বব
শ্রান্ত গীতলেখা ।

দ্বাদশীব চাদ, আব কোকিলেব গান ।
আব কি এমন ভাবে
তাহাদেব পাওয়া যাবে,
হে বন্ধু তোমাবে ?
বিলম্বিত তবণীব
সশঙ্কিত ক্ষেপণীব
ধ্বনি বাবে বাবে ।
সহসা শুনিল কান, হেবিল নযান,
দ্বাদশীব চাঁদ আব কোকিলেব গান ॥

১৯২৮

মরুপথিক চাঁদ

আকাশমরুর একেলা পথিক, চাঁদ,
চরণে তোমার, বরণে তোমার মৃত্যুর অবসাদ।

তুমিও একেলা, আমিও একেলা, শশী,
তবু তব টানে ভাবসমুদ্র উঠিতেছে উচ্ছ্বসি।

তুমি নির্বাণ, আমি নির্বাণী, রাকা,
তবু তব গীতি ধ্বনিয়া তুলিছে ম্লান ঝাউবীথি-শাখা।

বাণীহীন মোর অন্তরতলে, চাঁদ,
কত ইঙ্গিত সঙ্গীত খোঁজে, উদ্বেল কত সাধ॥

১৯৩৭

অবসন্ন চাঁদ

অবসন্ন চাঁদ!
কোথা সেই পূর্ণহাসি,
সুখসুপ্তিস্বপ্নরাশি,
চুম্বন-জাগানো সেই জ্যোছনার ফাঁদ,
যা হেরি ভেঙেছে রাত্রে বিরহের বাঁধ?
হায় শীর্ণ চাঁদ!
ধরণীর দিগন্ত যেমনি
ছুঁয়েছে, অমনি
স্বপ্নজাল গেল ছিঁড়ে,
হেথাকার আতপ্ত সমীরে
মুহূর্তেই হ'লে তুমি ম্লান কাঁদ-কাঁদ।
হায় মূঢ় চাঁদ!
ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না সখা, নেমো না নেমো না,
মুহূর্ত থেমো না।
হেথাকার তপ্তশ্বাসে
শিশির শুকায় ঘাসে,
বারেক বসন্ত আসে,
অতল অকূল সিন্ধু অশ্রুতে অগাধ।
হায় মূঢ় চাঁদ!

তুমি ধরণীর শিশু, তাই তো তোমার
হাসি বারম্বার
নিষ্পেষে অমার
চূর্ণ হয়, ম্লান হয়, নাহি মিটে সাধ।
হা অবোধ চাঁদ!

ছুঁয়ো না দিগন্ত বন্ধু,
অভাগার শোনো কথা শোনো,
তোমার সুধার পাত্র
রেখে দাও অহোরাত্র
ঊর্ধ্বতম নভে, ব'সে স্বপ্নজাল বোনো।
অবসন্ন চাঁদ!
ধরণীর দিগন্ত পরশি
স্বপ্নজাল গেল খসি
উঠিলে নিঃশ্বসি,
পৃথিবীর পাণ্ডুধূলি চিত্তে তব পশি
তোমার অমর স্বর্ণে মিশাইল খাদ।
হায় মূঢ়, হা মুমূর্ষু
শীর্ণ খিন্ন চাঁদ॥

১৯৩০

কোকিল

হে কোকিল গভীর রাত্রির,
হে কোকিল নির্জন শাখার,
হে চারণ লক্ষ বিরহীর
গীতিলুব্ধ মৌন বেদনার।
সম্পূর্ণ সংগীত তব উচ্ছ্বসিয়া উঠি
নিশীথের রুদ্ধ দ্বারে মরে মাথা কুটি।

নভস্তল তারকা-বিলীন,
শূন্য ভরি একখানি শশী,
ধরাতল জনপ্রাণিহীন,
শীর্ণ শাখে তুমি একা বসি।
আকাশে নীরব চন্দ্র, নিম্নে তব গীতি,
আজি রাত্রে বল দোঁহে কে কার অতিথি!

হে কোকিল, তব গীত-সুর
মিশে গিয়ে শোণিতের সনে
স্বপনেরে করিবে বিধুর,
সঞ্চরিবে সর্ব দেহে মনে।
কি আবেশে চমকিয়া জাগি নিদ্রালসা
শিহরি হেরিবে বক্ষে আঁচলটি খসা।

হে কোকিল, যবে রাত্রি ভোরে
ক্লান্ত চন্দ্র দিগন্তে গলিয়া
জন্ম লভে অতৃপ্ত অধরে
প্রণয়ের হাসিটি রহিয়া—
তখন তোমার গান, হায় বিহঙ্গম,
কোথা রবে—সে কি মিথ্যা? সে কি স্বপ্নসম॥

১৯৩১

ভদ্রার্জুন

কালো মেঘ চাপা দিল চন্দ্রে,
গঙ্গা যমুনা হ'ল আঁধারে ;
ছায়াকুন্তলভার খুলিল
বনলক্ষ্মীর শিরে বাঁধা রে ;
ঘন কুন্তলভার খুলিল,
চঞ্চল তালীছায়া দুলিল,
আধেক পড়িল খসে ডাহিনে,
আধেক পড়িল খসে বাঁ-ধারে।

মুক্তার রসে বুঝি ভিজিল,
রাঙিল মেঘের বাঁকা পাড়টি,
বাহুড়ের ছায়া-হানা গঙ্গা
থিরবিদ্যুতে আকা ধারটি।
দো-রঙা আচল কার খসিল,
পরশের রসে ধরা রসিল,
পার্থের রথে যেন আজিকে
ভদ্রা হয়েছে নিজে সারথি ॥

১৯৩৭

বাঁশরী

কি বেদনা জানায় বাঁশরী,
কি ব্যথা গভীর !
আশ্বিনের তৃণদল শিশিরমসৃণ,
আশ্বিনের শেফালিকা সুখস্বপ্নলীন,
আশ্বিনের নভস্তল মেঘচিহ্নহীন,
আনন্দিত চিত্ত যে কবির।
কি বেদনা জানায় বাঁশরী,
কি ব্যথা গভীর !

কি বেদনা জানায় বাঁশরী,
কি ব্যথা গভীর !
ক্ষণস্বর্ণ শিশিরাশ্রু কি তার সম্বল,
বেদনাঅরুণবৃন্ত শেফালির দল,
আকাশে আনত কার নেত্র ছলছল
উন্মথিত চিত্ত যে কবির।
কি বেদনা জানায় বাঁশরী,
কি ব্যথা গভীর।

কিবা জাদু জানো রে বাঁশরী
মায়ারসায়ন !
দুখেরে পরাও পায়ে হাসির নূপুর,
সুখেরে চমকি দেয় বিরহের সুর,
ঝড়ের মেঘের পাড়ে সঁপিলে মধুর
সোনা-ঢালা কত না বরণ।
কিবা জাদু জানো রে বাঁশরী
মায়ারসায়ন !

কিবা জাদু জানো রে বাঁশরী
মায়ারসায়ন !
পরালে ধরার চোখে অধরা কাজল,
স্বরগের আঁখিপাতে ঘনালে বাদল,
চিত্ততলে জাগাইলে সুরের কমল
আত্মহারা দোটানা কবির,
কিবা জাদু জানো রে বাঁশরী
মায়াসুগভীর ॥

১৯৩১

এ বসন্তে চিনি

এ বসন্তে চিনি আমি, দেখিয়াছি তারে
চর-জাগা পদ্মা যেথা দিগন্তের ধারে
দূরায়িত অতীতের বাষ্পলেখা প্রায়,
কিংশুকের পূর্বরাগে কাননে যেথায়
ভ্রমর-ঝংকৃত পুষ্পে বাজে রিনিঠিনি
স্মৃতির কিঙ্কিণী,
এ বসন্তে চিনি।

এ বসন্তে জানি আমি, কতবার তায়
দেখিয়াছি ছদ্মবেশে আসিয়া ধরায়
একটানে উতারিয়া রক্ত যবনিকা
শিমুল দাড়িম্ব বর্ণে করিয়াছে ফিকা,
মুখর করেছে পিকে চূতাঙ্কুর হানি,
জাগায়েছে বাণী,
এ বসন্তে জানি।

এ বসন্তে হেরি মোর লুপ্ত কাল হতে,
আসিতেছে বিরহের বৈতরণীস্রোতে
বিস্মৃত বেদনা যত হংসদূত প্রায় ;
সুখ এলো স্মৃতি হয়ে, অশ্রু এলো হায়
জলশূন্য শুভ্র মেঘে প্রশান্ত চিত্তেরি
দিগ্‌বলয় ঘেরি—
এ বসন্তে হেরি ॥

১৯৩৭

গানের সময়

শিশির ঝরার এই তো সকাল,
কবিদল গান গায়,
কুসুম ফোটার বসন্তকাল
চুম্বন-মৃদু বায়।
যুগল কোকিল দুই তরু হতে
সুরের বসন বোনে বায়ুস্রোতে,
পলাশ রাঙায় পাড়খানি লাল,
কবিদল গান গায়।

ভালোবাসিবার এই তো নিমেষ,
মন-বদলের ক্ষণ,
সজিনার ফুলে শিশিরের রেশ
রহিবে যতক্ষণ।
ঊর্ণাতন্তু ক্ষীণ ভালোবাসা
বেশি খন রবে নাহি হেন আশা,
পলক নিপাতে হয় হোক শেষ
মন-বদলের ক্ষণ॥

১৯৩১

পথিক ফুল

পথপাশে রহি পথিকের চোখ
কাড়িতে নারো,
ধূলায় কেবল রাঙা হয়ে ওঠে
রঙটি আরো।
পথিক হাসিয়া বলে যায় শুধু—
বক্ষে ইহার নাই তো রে মধু
চক্ষে তেমন ঘোর।
তোমরা কেহই জানো না জানো না
সুধাসন্ধান ওর।

ভ্রমর আসিয়া মধু চাহে যবে
নীরবে রহো,
শরমে মুখটি লাল হয়ে ওঠে,
সকলি সহো।
আপনি জানো না অন্তরে তব
ছিল যে এমন সুধা অভিনব
নয়নে এমন ঘোর।
বিদেশী কবি যে পেয়েছে হঠাৎ
সুধাসন্ধান ওর।

কার সুধা থাকে কোথায় লুকানো
কেহ না জানে,
কারো বুকে, কারো সর্ব অঙ্গে,
কাহারো প্রাণে।

রসিকজনের হৃদয়ের কাছে
গন্ধ যে তার লুকাইয়া আছে
চক্ষে রয়েছে ঘোর।
ভালোবেসে দেখে যেজন সে পায়
সুধাসন্ধান ওর।

আপনার রঙে রাঙাইয়া দেখা
সেই তো দেখা,
পথেঘাটে তার মনের মানুষ,
নহে সে একা।
সরস হইলে আপন হৃদয়
নিখিল বিশ্ব হবে মধুময়,
চক্ষে লাগিবে ঘোর।
উদাস পথিক পাইবে তখন
সুধাসন্ধান ওর॥

১৯২৫

আকাশকুসুম

দিগন্তের গিরিশিরে উঠিল চন্দ্রমা,
আশ্বিনের কোজাগরী ; উপত্যকা মাঝে
মেঘকল্প বনস্তর, নিম্নে ভাঁজে ভাঁজে
থাকে থাকে আলো আর অন্ধকার জমা
পাহাড়ের গা বহিয়া নামে চন্দ্রালোক
দুধরাজ সরীসৃপ ; ছায়া বনানীর
পায়ে পায়ে হটে আসে ; দূর স্রোতস্বীর
আচম্বিতে ক্ষণ-দৃশ্য রজত-ঝলক।
গিরি-উপত্যকা হতে পুঞ্জ কুহেলিকা
রাশি রাশি উদ্বেলিত—ভ্রাম্যমাণ ঘুম,
চাঁদ হানে অঙ্গে তার ইন্দ্রধনু-লিখা,
দিগঙ্গনা ছোঁড়ে যেন স্বপ্নের কুঙ্কুম।
তামসীর ভালে এ কি জ্যোতির্ময়ী টিকা,
কে বলিল সত্য নয় আকাশকুসুম॥

১৯৩৮

তুষার

অনন্ত তুষার আছে আমার মনের
অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে, সেথা ভাঁজে ভাঁজে
আলোছায়া বন্দী হয়ে একান্ত বিরাজে ;
নিত্য সেথা মুকুরিত শুভ্র গগনের
আভা ও আভাস স্বচ্ছ ; সেথায় হিমের
শাশ্বত ফলক পরে চলিছে পরখ
রঙে রঙে রেখান্যাসে মুগ্ধ করি চোখ
শচীর কঙ্কণ লাগি দিব্য সুবর্ণের।
কিসের এ তুষারিত স্তম্ভিত বেদনা ?
এ বিরাট অশ্রুস্তূপ নহেকো সঞ্চয়
এক জীবনের শুধু। উজ্জ্বল অক্ষয়
এ কিরীট শিরে ধরি জন্মজন্মচয়
চলিয়াছি দীর্ঘপথ—বিলুপ্তচেতনা
যে-বীথিতে বিস্মৃতিরো নাহি আনাগোনা।

১৯৩৮

কুজ্‌ঝটিকা

ধীরে ধীরে ওরা উঠে চলে এলো,
পাহাড়ের গায়ে ছুটে চলে এলো,
অজানা ফুলের মধু লুটে এলো
আলোকবিজয়ী কুজ্‌ঝটিকা।
এতখন কোন্ গুহার ভিতরে
পাইনের ছায়ে ছিল যে কি-ক'রে,
গেঁথে নিয়ে মালা নীহার-নিকরে
কপোতধূসর-বরণ-লিখা।
ওই ডুবে যায় পাইনের সারি,
মহেশের ঋজু তপোবন-দ্বারী,
পাহাড়ীর বাড়ি যায় রে !
আলোঝলমল গিরিদরী তলে
দলে দলে গাঢ় ছায়া ফেলে চলে ;
থাকে-থাকে নামা চায়ের বাগান
ক্ষণেকের মাঝে কোথা অবসান,
আঁধারে মিলায় হায় রে।
সূর্যের ভালে দিয়ে আসে ওরা
পাতালের কালো কলুষ-টিকা,
কুজ্‌ঝটিকা।

ঐরাবতের দল এলো ওরা আলোকতৃষারি
কুজ্‌ঝটিকা,
রবির কিরণ মৃণালগুলিরে
উপাড়িয়া নিলো শুণ্ডে তুলি রে,

গিরিসংকটে রাস্তা ভুলি রে
চলে দুলি দুলি, বরন ঝিকা।
ধুপি গাছে ঢাকা শ্যামল পাহাড়ে
গাঢ় ছায়াখানি পড়ে বারে বারে,
গুহার মাঝারে কালো,
শিখরের কোন্ মর্মের মাঝে
গুপ্ত ঝোরার মর্মর বাজে,
উর্বশীহারা পুরূরবা প্রায়
রৌদ্র এখানে ছায়ারে ধেয়ায়,
অশ্রুকোমল আলো।
বহুবিরহের দীর্ঘবেদনা
শ্বসিতেছে হেথা তুষারশিখা,
কুজ্ঝটিকা।

নিজেরে ঘেরিয়া ঘনায়ে তুলিলে
এ কেমনধারা কুজ্ঝটিকা ?
এ গিরিশিখরে ওগো শিখরিণী,
ভেবেছিনু তব হৃদি লব জিনি,
সন্দেহ লাগে চিনি কি না চিনি·
বিধাতার পরিহাস এ লিখা !
সেখানে আছিলে পল্লীবেশিনী,
এখানে হেরি যে স্বপনদেশিনী,
উদাসকেশিনী, মরি !
আধো আবরণে, আধো আভরণে
এ কি লুকোচুরি আপনার সনে,

আধো কুয়াশায়, আধেক আশায়
বহু সঞ্চিত প্রেম-তিয়াষায়
তুলিছ জটিল করি।
বিস্মরণের কুহেলিকাতলে
ঢাকা দিলে ভালে স্মৃতির টিকা,
কুজ্ঝটিকা।

মেঘলোকে আজ এ কি দেখা, সখী,
আলো-আঁধারের প্রান্তে এসে,
গ্রীষ্মতাপিত পাগলা ঝোরার
মতো তব তনু বিরহে কাহার
ব্যথার উপলে তোলে ঝঙ্কার,
কভু আঁখিজলে, কখনো হেসে।
ওই হাসিখানি, হাসি সে তো নয়,
খর তপনের সহে না প্রণয়,
জানি পরিচয়, সখী,
ছিল যা স্বপনে, থাক্ তাহা মনে,
কল্পলতা কি বাঁচে এ ভুবনে!
হাসিকান্নার সুমেরুশিখরে
কেন হেন আজ পলকের তরে
হল মিছে চোখোচোখি,
এ হাত যা কভু পাবে না নাগাল
তারি লাগি মরি দীনের বেশে।

অনেক দেখাই এ জীবনে, সখী,
এই কুয়াশার ঘোমটা-আড়ে।

অনেক দেখাই এ জীবনে হায়
ক্ষণদুর্লভ পাহাড়ী উষায়
গৌরীশিখর সম আভা পায়
বাষ্পবিভোল দিকের পারে।
ইন্ধনহীন শিখার মতন
তব তনুখানি ধ্যাননিমগন
নিজেরে দগ্ধ করি।
অয়ি কেশান্তশিখা-স্বরূপিণি,
তব পরিচয় নব প্রতিদিনই!
ওই আঁখিদুটি তুলিছে কেবল
গিরিশিখরের স্বর্ণকমল
ভোর হলে বিভাবরী ;
যেটুকু তোমার পড়ে না নয়নে
সেইটুকু বেশি হৃদয় কাড়ে।

গিরিশিখরের পাইনের শাখে
উঠে এলো ধীরে পূর্ণশশী,
ম্লান ছায়াখানি নির্মোকপ্রায়
নেমে এলো ক্রমে পাহাড়ের পায় ;
আলোর আঁচল পড়িল ছড়ায়ে,
রজনীর গেল ঘোমটা খসি।
অতি অতিদূরে ধ্যান-পারে যেন
জাগে নিশ্চল সত্যের হেন
দিগন্তে গিরিরেখা,
পুঞ্জিত ঘন কালো কুহেলিকা
লভিল ইন্দ্রধনুকের লিখা,

শুক্তির মাঝে মুক্তার মতো
এই কুয়াশার মর্মে সতত
পাবো না কি তব দেখা।
মহুয়াপাণ্ডু নিভন্ত চাঁদ
ধীরে ছিঁড়ে পড়ে কাননে পশি।

তবে তাই হোক, ঘনাক আবার
তোমারে ঘেরিয়া কুজ্ঝটিকা।
মনের মানুষে দেখেছে কে কবে ?
শুধু খুঁজে মরা, আধো-অনুভবে,
শুধু সন্দেহ—বুঝি হবে হবে,
দীপ নাহি হেরি, কেবলি শিখা!
কৃতার্থ আমি যদি এই ক্ষুধা
থাকে চিরদিন, নাহি চাই সুধা,
যেন এ তৃষ্ণা থাকে।
এই কুয়াশার মাঝে নিরবধি
ধন্য তোমারে খুঁজে ফিরি যদি,
এ পারেতে ছিল আমারি খানিক,
ও পারেতে হবে ধ্যানের মানিক
কল্পতরুর শাখে।
তোমার লাগিয়া এই সন্ধান
চিরকাল মোর থাকুক লিখা।
কুজ্ঝটিকা॥

১৯২৯

দেবীদর্শন

দেবদর্শনে এসে আজ হেথা
পেয়েছি দেবীর দেখা,
নাটমন্দিরে স্তম্ভের পাশে
দাঁড়িয়ে ছিল সে একা।
ডান হাতে তার পূজার পুষ্প,
রক্তকরবী-মালা,
বাম হাতে তার সোনার থালাতে
প্রদীপের কুঁড়ি জ্বালা।
দৃষ্টিতে তার কুসুমস্পর্শ,
দৃষ্টিকুশলা নারী,
চন্দনফোঁটা ললাটে মিলায়
এমন বর্ণ তারই।
দেবহস্তের অলখ তিলকে
অলক উঠিছে মাতি,
ওড়না-আড়ালে কালো কেশপাশে
জ্যোৎস্না-আবৃত রাত্রি।
ক্ষুব্ধ সিন্ধুপুলিনে সে যেন
করুণ চন্দ্রলেখা।
দেবদর্শনে এসে আজ হেথা
পেয়েছি দেবীর দেখা।

লুব্ধ যাত্রী-জনতা করিছে
দেবতা প্রদক্ষিণ,
পত্রপুষ্প অর্ঘ্য উদকে
ঠাসা সমস্ত দিন।

শিকলে ঝোলানো পিতল-ঘণ্টা
টানে যাত্রীর দল,
গম্ভীর সাড়া দেয় মৃদু ধ্বনি
ভেদি রহস্যতল।
মর্মরঘন দেবকুট্টিমে
রক্তবরন পায়
ক্ষণিক-কমল বিকশি বিকশি
তরুণী যাত্রী যায়।
শত যাত্রীর নিঃশ্বাসবাযে
সোনার প্রদীপ কাঁপে,
পূজার পুষ্প ম্লান হয়ে আসে
গভীর রৌদ্রতাপে।
স্বর্ণ-ত্রিশূলে ত্রিধা কি বারতা
আলোতে হয়েছে লেখা!
দেবদর্শনে এসে আজ হেথা
পেয়েছি দেবীর দেখা।

চলিল রমণী, অমনি যেন রে
অঙ্গে লাগিয়া তার
নিটোল রৌদ্র সহস্র ভাগে
হয়ে গেল চুরমার।
ও গতিভঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে
জোয়ার লাগিল যেন
বহুবল্লভা বীণার তারেতে
গুণীর আঙুল হেন

দেবতারে চায় সকলে, কিন্তু
দেবী সে কাহারে চায়,
আপনারে ভুলি নিরেট পাথর
ঘুরে মরে বৃথা হায়।
ভগবান নাকি নিজেরে হেরিয়া
গড়েছেন নরনারী,
তারো চেয়ে আছে সত্য কথা, তা
আজিকে বলিতে পারি।
নিজেব মতন গড়িছে দেবতা
মানুষে, হল তা শেখা;
দেবদর্শনে এসে তাই হেথা
পেলাম দেবীর দেখা॥

১৯২৭

সহচরী

হে সহচরী,
ছেড়ে গেছি বলে ব্যথা পাও যদি
সে ভয়ে মরি।
দূর গিরিশিরে দেখ আঁখি তুলি
জলভরা মেঘ করে কোলাকুলি,
তার পরে হায় বায়ুভরে ছুলি
যায় যে সরি,
গিরি অচপল, মেঘ হল জল
আকাশ ভরি।
ব্যথা যদি পাও, চেয়ে দেখে নাও
হে সহচরী।

যা ছিল মনে
রূপ দিতে তারে পারিলাম কই
আলিঙ্গনে।
বৃথা দিগন্ত রয়েছে পড়িয়া
ধরণীর পানে বাহু পসারিয়া,
চলে যায় তার সম্মুখ দিয়া
ক্ষণে-ক্ষণে
ছায়া-আলোকের তরঙ্গ চের
গাঁথি স্বপনে।
ব্যথা যদি পাও, তবে দেখে নাও
ছুটি নয়নে।

ধরাতে আর
কেহ কভু কারে মনে রাখে না রে,
ধারে না ধার।
যদি কভু দেখ বাষ্পের মতো
দুটি স্মৃতিভারে দুটি আঁখি নত,
তখনি তাহারে করুক আহত
হাসির ঠার।
দেখ নি হাওয়ায় কেমনে ভাসায়
মেঘের ভার।
ব্যথা যদি পাও, চেয়ে দেখে নাও
এ সংসার।

শাসন ভুলে
দেখা যদি দেয় দুটি ফোঁটা জল
নয়নমূলে,
স্বাতীতিথিশায়ী বারির মতন
রেখে দিয়ো তারে হৃদয়ে গোপন,
বাহিবে আনিয়ো মুক্তা নূতন
শুকুতা খুলে,
তারাই আবার বিঁধিবে ব্যথারে
হাসির শূলে।
ব্যথা যদি পাও, চেয়ে দেখে নাও
নয়ন খুলে॥

১৯২৭

জাগিলে কি পারিতাম

একদিন অন্যমনে অবসর-বিনোদন-ছলে,
সে যবে ঘুমায়ে ছিল, (জাগিলে কি পারিতাম !)
শিথিলিয়া দিয়াছিনু কেশগুচ্ছ নিপুণ কৌশলে
শুভ্র শয্যাতলে।
(জাগিলে কি পারিতাম !)
প্রলয়পয়োধি-বারি অকস্মাৎ উঠিল তুলিয়া,
আচ্ছাদিল গ্রীবাশঙ্খ, আচ্ছাদিল তনু রমণীয়া,
নামিল চুলের বন্যা বেলাশুভ্র পালঙ্ক ছাপিয়া, হায়
(জাগিলে কি পারিতাম !)
আদিম অরণ্যচ্ছায়া-আপ্লুত সে অমিশ্রতিমিরে,
তবু সে ঘুমায়ে ছিল, (জাগিলে কি পারিতাম !)
স্বপ্নের উজান স্রোতে চলে গেনু আর-বার ফিরে
আদি জন্মতীরে !
(জাগিলে কি পারিতাম !)

১৯৩৭

পুরুষ ও প্রকৃতি

তুমি যদি হও আকাশকুসুম কঠিন বোঁটার বাঁধন ভুলি,
আমি যদি হই অস্তমেঘের ক্লান্ত করুণ পাপড়িগুলি,
কোথাও থাকে না কোনো ব্যবধান, বুকে বুকে সুখে লাগিয়া থাকি,
তুমি যদি হও আকাশকুসুম, পাপড়ি হইয়া তোমায় ঢাকি।

আমি যদি হই ঝড়ের মুখের আর্ত আনত পালের খুঁটি,
তিমিরপুচ্ছতাড়িত সাগরে তুমি যদি হও মুক্তামুঠি,
মরণে তাহলে ভয় বা কিসের—সাগরের তলে বাসরঘর,
তুমি মৌক্তিক আমি ডোবাতরী, সিন্ধু দোলায় স্বয়ম্বর।

এ সব কিছুই হল না রে সখী, তুমি হলে শুধু কঠিনা নারী,
আমি প্রেমভীরু উদাস পুরুষ,—বলো বিধাতার কেমন আড়ি!
চোখে দেখিলাম, কাছে আসিলাম, পরশ লভিতে গেলাম সরে;
তুমি নারী আর আমি যে পুরুষ!—এ কি দ্বিধা হায় জগৎ ভরে॥

১৯২৬

শকুন্তলার উৎকণ্ঠা

মালিনীর উপকূলে জাগাইয়া চকিত দক্ষিণ
উত্তরিল মধুমাস প্রথম যেদিন,
অঙ্গন-উটজছায়ে অকস্মাৎ নিত্যকাজ ভুলি
উদ্‌গ্রীব প্রত্যাশা-ভরে দিগন্তরে ব্যগ্র আঁখি তুলি
কি করিল শকুন্তলা কে জানে সে কথা!

মালিনীর উপকূলে দাড়িম্বের জ্বলন্ত শিখায়
হিমানীর মৃত্যু আজি শীতের চিতায়।
মৃগীর চঞ্চল চোখে, আচম্বিতে রোমন্থন ফেলি,
তাকাইল মৃগদল ; সে সময়ে ক্ষুব্ধ আঁখি মেলি
কি গাহিল শকুন্তলা কে জানে সে কথা !

মালিনীর উপকূলে জ্বালাইয়া কিংশুকের শিখা
পঁহুছিলে নন্দনের লক্ষ সাহসিকা,
মাধবীকুঞ্জের ফাঁকে কারে চাহি দাঁড়াইল বালা,
অসংবৃত কেশ হতে খসে গেল মল্লিকার মালা ;
কি ভাবিল শকুন্তলা কে জানে সে কথা !

মালিনীর উপকূলে নেশারক্ত করবী কাঞ্চন
বারিবক্ষে নিক্ষেপিল চকিত চুম্বন,
আজিকে কোথাও তারে না পাইল খুঁজিয়া সংগীতে,
খিন্ন কমলের দলে একাকিনী নখাগ্র-ভঙ্গীতে
কি লিখিল শকুন্তলা কে জানে সে কথা !

মালিনীর উপকূলে গন্ধগুরু আতপ্ত বাতাসে
পুষ্পের বারতা আসে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে—
প্রাচীন পদাঙ্ক-আঁকা বালুতটে দাঁড়াইয়া ধীরে
অন্বেষণে শ্রান্ত আঁখি নামাইয়া ক্লান্ত নদীনীরে
কি হেরিল শকুন্তলা কে জানে সে কথা॥

১৯২৭

দুষ্মন্তের খেদ

ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না চূতমঞ্জরী, ঝরায়ো না মিছে পুষ্পধূলি,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
কুরুবক থাক্ কোরকে বদ্ধ, হায় পিক, তুমি কণ্ঠ খুলি
গাহিবে যে সুর, আঁখি ভরপুর,
আজি কতদূর শকুন্তলা !

মালিনীর তীরে চরণের ছায়া ঢাকিয়াছে লোভী দূর্বাঘাস,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
বনজ্যোৎস্নার কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরে বায়ু ফেলি দীর্ঘ শ্বাস ;
মাঠেও তো নাই, বাটেও তো নাই,
ঘাটেও তো নাই শকুন্তলা !

শচীতীর্থের বারি কাঁদে আজ, ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পনেতে
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
তরল-বাঁধনে রবে নাকো প্রেম, রবে প্রেম দৃঢ় বন্ধনেতে,
দূরে গেলে হায়, চোখে পড়ে যায়,
তাই তো কাঁদায় শকুন্তলা !

এখনো তাহার পরশতপ্ত অঙ্গুরী হানে অঙ্গে সুধা,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
এই যে তাহার কবরীর ফুল, বক্ষে জাগায় স্মৃতির ক্ষুধা,
ভালোবাসাহীন স্মৃতি চিরদিন
বজ্র কঠিন, শকুন্তলা !

থামাও, থামাও কঠিন বাঁশরী, থাক্ বীণা বেণু সেতার থাক্,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
উপবন হোক উৎসবহারা, অশোক পলাশ দীপ নেভাক,
থামায়ে দে গান, কুসুমের ঘ্রাণ,
জ্যোৎস্নার বান—শকুন্তলা !

অঙ্গুরীহারা একাকিনী প্রিয়া, না জানি গো আজ সে কোন্ দেশে?
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
সিঁথির প্রান্তে ডোবে রাঙা রবি, তিমির ঘনায় নিবিড় কেশে।
রবি ডুবে যায়—তিমির ঘনায়,
একাকী কোথায়—শকুন্তলা!

বনের আড়ালে হঠাৎ চন্দ্র, নিশি-নির্জনে হঠাৎ গীতি,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
সকল জীবন মন্থিয়া তোলে গত জনমের দুখের স্মৃতি।
অতীত কেবল, ঘেরা-আঁখিজল
রক্তকমল – শকুন্তলা!

গত দিবসের রৌদ্রকিরণে তপ্ত আজিও বনের কুঁড়ি,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
সহসা সে কেন জাগায় অমৃত গন্ধে যাহার ভুবন জুড়ি
লক্ষ ভ্রমর স্মৃতিজর্জর
গাহে মর্মর – শকুন্তলা!

১৯২৮

শকুন্তলা

হে সুন্দরী শকুন্তলা, বহুবর্ষ পরে
তোমারে স্মরিছে আজি বিদেশের কবি,
তুমি ঠাঁই লভিয়াছ অনন্তের ঘরে
তাই চির-উদ্ভাসিত তব নিত্য-ছবি।
বনজ্যোৎস্না-লতাকুঞ্জে তব গাত্রলীন
খিন্ন শতদলগুলি গেল যা ঝরিয়া,
তারি গোটা দুই লাগি চিররাত্রিদিন
উদ্‌ভ্রান্ত অধীর চিত্ত মরিছে কাঁদিয়া।
অধিক করি না আশা তোমার নিকটে,
জীবনের জীর্ণজ্বরে না পারি ঘুমাতে,
মোরে শান্ত করি দাও—চাহি বারে বারে
তোমার অমর-করা একটি চুমাতে।
দুষ্মন্ত পাবে না টের, নাহি কালিদাস—
এ গুপ্ত রহস্য আর কে করিবে ফাঁস?

পুরূরবা

আমি হতবাক্ পুরূরবা
চির-সন্ধানরত,
আপন গানের তানের পিছনে
হতভাগ্যের মতো।
আমি গতবাক্ পুরূরবা
ছায়া-রৌদ্রের সাথী,
ক্ষণিক-সুখের পাখীর লাগিয়া
ফিরি মায়াজাল গাঁথি।
কোন্ বিহঙ্গ নন্দনচারী
আমার কুলায়ে গেল পাখা ঝাড়ি,
রঙিন পালক কুড়ায়ে তাহারি
ফিরি যে দিবসরাতি ;
আমি হতবাক্, আমি গতবাক্,
ফিরি মায়াজাল গাঁথি।

আমি নির্বাক্ পুরূরবা
চির-মন্দারলোভী,
গোধূলির চর, স্বপনদোসর,
ছায়া-আলোকের কবি।
প্রিয়ার যুগল কপোলের ধারে
যে ক্ষণকুসুম উঁকিঝুঁকি মারে,
ওগো বল্ তোরা কেমনে তাহারে
বারেক পরশে লভি,
নিমেষ-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম
সেই মন্দারলোভী।

সকাল বেলার শিশিরফোঁটায়
উর্ণাতন্তু-হার
মৃণালকোমল কণ্ঠে উঠিতে
সবুর সহে না যার,
শরৎপ্রাতের রোদভাঙা মেঘে
ঝরে যে বাদল বাতাসের বেগে,
ঝড়ের আকাশে চাপা চাঁদ লেগে
জ্বলে যে মেঘের পাড়,
আমি উদ্‌বাহু পুরূরবা
ফিরি সন্ধানে তার।

আমি উদ্‌গ্রীব পুরূরবা
চির-সন্ধানরত,
নিখিল নারীর নয়নে নয়নে
কে যেন তাহারি মতো!
সকলের ঠোঁটে তারি আভাখানি,
সকল কণ্ঠে তারি সুধাবাণী,
একঠাঁই তারে পেতে চাই আমি
এক দেহে সংহত;
নিখিল নারীর রূপমন্থনে
তাহারে করেছি ব্রত।
আমি উদ্‌বেল, আমি উদ্‌বাহু,
চির-সন্ধানরত॥

১৯৩১

ঊর্বশী

মানুষের ঘরে ছিল একদা
জানি সে কথা,
হৃদি-সিকতা
সিক্ত আজো।

মানুষের ঘরে ছিল সে নারী,
হৃদয় কাড়ি
গিয়েছে ছাড়ি ;
রিক্ত আজো,
মানবহৃদয় রিক্ত আজো।

দুখের দ্রাক্ষা ফেটেছে মুখে,
সে রস ঢুকে
জীবনে, বুকে
তিক্ত আজো,
মানবজীবন তিক্ত আজো।

মিলনের মধুচক্র গত,
মধুপ যত
স্বপ্ন-মতো
পৃক্ত আজো,
মন-শাখে সম্পৃক্ত আজো।

সুখ গেছে, তবু স্মৃতিশকুন
ছাড়ে না তৃণ,
একি দারুণ
রিক্‌থ আজো,
অনাদি আদিম রিক্‌থ আজো।

বিরহে মিলনে সন্ধি হবে
আর কি ভবে
হায় রে কবে?
ঠিক তো আজো,
পৃথিবী তেমনি ঠিক তো আজো।

তেমনি পড়িয়া সকলি আছে,
কানের কাছে
বকুল গাছে
পিক তো আজো,
তেমনি ডাকিছে পিক তো আজো॥

১৯৪০

স্বপ্নদাস

স্ফটিক-মন্দির আমি গড়েছি মোহের।
নিরঞ্জন শুভ্র হেথা দীন ভৃত্যসম
প্রাচীরে প্রাচীরে রচে কি বিচিত্রতম
সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনু লক্ষ বরনের।
স্ফটিক-মন্দির আমি গড়েছি মোহের।
অশ্রুর ত্রিশিরা-কাচে জীবনের তাপ
আকাশে ছড়ায় কার প্রগল্‌ভ কলাপ,
স্বপ্নে-দেখা ছবি সে যে কোন্ নন্দনের।
স্বপ্নের নহিকো ভৃত্য, সে আমার দাস।
অদম্য গরুড়ে তাই হয়েছি উধাও
সুধাব্রতে, অসম্ভব চন্দ্রলোক পানে।
তোমরা স্বপ্নের ভৃত্য—তাই এত ত্রাস,
কখনো তাহার দৃষ্টি এড়াবারে চাও,
কভু স্তুতি করো তারে—কবিতায়, গানে॥

১৯৪০

চকোর ও চাতক

স্বপ্নের চকোর এলো অর্ধরাতে
মৃদু জ্যোছনাতে,
চন্দ্রিকা-পিচ্ছিল
ডানায় শিথিল
নাহি স্পন্দ, নাহি কোনো ধ্বনি,
চঞ্চুতে আনিল বহি স্বপনের চন্দ্রকান্তমণি।

স্বপ্নের চাতক এলো দ্বিপ্রহরে
মোর শূন্য ঘরে ;
স্বচ্ছ পক্ষ হ'তে
অবিরাম স্রোতে
ঝরে জল গলিত নবনী,
চঞ্চুতে আনিল বহি স্বপনের সূর্যকান্তমণি॥

১৯৩৮

স্বপ্ন

স্বপ্ন আসে মাঝে মাঝে
বাস্তবের মুখোশ পরিয়া,
কি আতঙ্কে উঠি শিহরিয়া।
অমনি সে
মৃদু হেসে
খুলে ফেলে সে মুখাবরণ,
দেখি আছে শাশ্বত স্বপন,
সেই পরিচিত মুখ
আশ্বাসের হাসিতে ভরিয়া,
কি উল্লাসে উঠি শিহরিয়া॥

১৯৩৮

স্বপ্নায়ন

এসো, যাক্ স্বপ্ন দেখা
কচি ঘাসে শুয়ে একা,
আকাশের মেঘ আর
বাতাসের বেগ আর
কাননের ফুল আর
দেউলে ত্রিশূল আর
বিদ্যুতের রেখাক্ষরে লেখা,
এসো, যাক্ স্বপ্ন দেখা।

এত যে স্বপন দেখি
মিথ্যা হ'তে পারে সে কি ?
রজনীর তারাদল,
শিশিরের ধারাজল,
শরতের নীল নদে
ভেসে যায় নিঃশবদে
ফেনপুঞ্জে শঙ্খচিল—একি !
এত যে স্বপন দেখি।

স্বপনের রসায়ন
মনে রচে রামায়ণ।
প্রকৃতি নির্মোক শুধু
মিছে কেন শোক শুধু,
যা আছে তা আছে মনে
বিশ্বের প্রাণ স্বপনে,
বিশ্ববৃন্ত, পদ্ম সে স্বপন,
মনে রচে রামায়ণ ॥

১৯৩৮

প্রথম নিদ্রা

হে আদি দম্পতি, আমি ভাবিতেছি ব'সে
আদিম ধরাতে যবে প্রথম প্রদোষে
স্বপ্নের ইঙ্গিত ভরে সন্ধ্যাতারাটির
মৃগয়ানিবদ্ধধনু শিথিলশরীর
এলাইয়া দিল দেহ প্রথম সন্ধ্যায়
তব প্রিয়তম ধীরে, সে রহস্য, হায়,
কি বিস্ময়ভীতি তব সঞ্চারিল মনে।

আকুল আগ্রহে তুমি তারে ক্ষণে ক্ষণে
নাড়া দিলে বারে বারে, নামখানি ধ'রে
ডাকিলে কত-না বার অভিমান ভরে,
কবরীবিচ্যুত ফুল গুঁজে দিলে হাতে,
নিল না সে পড়ে গেল, প্রথম সে রাতে।

তার পরে কখন যে স্বপ্নের আভাসে
আপনি পড়িলে ঢলি প্রিয়-বাহুপাশে॥

১৯২৫

প্রথম মৃত্যু

হে আদি দম্পতি, আমি ভাবিতেছি ব'সে
সৃষ্টির নির্জনে সেই চেতনা-প্রদোষে
এলাইয়া দিল দেহ প্রিয়তম যবে,
ভাবিলে গৃহের কর্মে, বুঝি নিদ্রা হবে।
বল্কল-অঞ্চল টানি বুকের উপরে
শত তুচ্ছ কর্ম নিয়ে ছিলে বনঘরে।
সহসা জাগাতে তারে করিলে প্রয়াস,
নড়িল না, জাগিল না, তুমি ভগ্নআশ
নিশ্চিন্তে ঘুমালে রাত্রি প্রভাতের তরে।
ভাঙিল না ঘুম তবু ; কি বিস্ময় ভরে
ভাবিলে এ কোন্ নিদ্রা, কোথা এর তল ?
প্রথম নয়নে তব এলো মৃত্যু জল।
তার পরে, কত পরে কেমনে তা বলি,
তুমিও তো সে নিদ্রায় পড়িয়াছ ঢলি॥

১৯২৫

মৃত্যু

১

মৃত্যুরে করি না ভয় হেন মিথ্যা কথা
কেমনে বলিব বলো ? আলো, হাসি, গান,
ফুল, ফল, সখ্য, প্রীতি, স্পর্শ, রস, ঘ্রাণ
অকস্মাৎ নির্বাপিত, নিত্যনীরবতা।
স্বপ্নের শিখর হতে দেখেছে যাহারা
মৃত্যুর এ উপত্যকা—কি তাহারা জানে ?
পদে পদে সর্প হেথা মৃত্যুবাণ হানে—
ছায়াশূন্য, মায়াশূন্য, স্বপ্নের সাহারা।
জীবনসমুদ্র মাঝে চলেছি ফেলিয়া
দিবারাত্রি লুব্ধ জাল ; চক্ষু ঝলসিয়া
ওঠে মুক্তা, রত্ন কত কল্পনা-রঙিন,
অন্তিম সন্ধ্যার ক্ষণে শেষে একদিন
সোনার কলস ওঠে, খুলি মুখ তার
ক্রুদ্ধ দৈত্য বাহিরায়, মৃত্যু নাম যার॥

১৯৩৮

মৃত্যু

২

কেন নয়? কে বলিল খণ্ডিত মৃত্যুই
দীর্ঘায়িত জীবনের নহে পূর্ণচ্ছেদ?
বিস্মৃতির পরপারে তুলি চক্ষু দুই
শূন্যপানে মিথ্যা চেয়ে বৃথা লক্ষ্যভেদ।
বলো এইখানে শেষ, সমাপ্ত জীবন।

প্রযোজক টেনে দিল অন্ত্য যবনিকা,
বিস্মৃতির বীথিপথে প্রেতের মতন
ছুটে চলে দেহচ্যুত অঙ্গার-কণিকা
সাজসজ্জা খুলে ফেলে। পুনঃ প্রযোজক
ঢালিবে নূতন ছাঁচে বস্তুকণাগুলি,
রাঙাবে নূতন রঙে মুষ্টিমেয় ধূলি,
নব রঙ্গে, অসংকোচে—প্রয়োজন হোক।

আবার টানিয়া দিবে কৃষ্ণ যবনিকা,
নাট্য মিথ্যা—সত্য ওই অঙ্গার-কণিকা॥

১৯৩৮

মৃত্যু

৩

গিরিরাজ, আমি এসেছি তোমার কাছে—
মৃত্যুর রহস্যবার্তা লেখা কি গো আছে
ওই তব তুষারের শাশ্বত পাতায় ?
বর্ণের আভাসে আর রেখায় রেখায়
কি বাণী ফুটাতে চাহ তুষার-ফলকে ?
কুজ্ঝটির আস্তরণে পলকে পলকে
ঢাকিয়া দিতেছ তুমি দৃশ্য, রস, রূপ ;
আবার গুটায়ে লয়ে নূতন স্বরূপ
করিতেছ উদ্ঘাটন। মৌন জাদুকর,
আমার এ জিজ্ঞাসার পাব কি উত্তর ?

আত্মার প্রমাণ নাই, অঙ্গার-কণিকা
প্রমাণের নিরপেক্ষ, এই শুধু লিখা
ওই তব তুষারের ত্রিকালজ্ঞ বেদে ?
কিসের সান্ত্বনা তবে মৃত্যু অবচ্ছেদে ॥

১৯৩৮

মৃত্যু

৪

ঘনিষ্ঠ নিকটে মৃত্যু দেখেছি এবার।
এতদিন ছিল সে যে দূরের পাহাড়,
স্বপ্নের সীমান্তশায়ী, নেত্রমনোরম,
নব মেঘোদয়ে দোঁহে হয়ে যেত ভ্রম।
এবার নিকটে মৃত্যু, পাহাড় সে বটে।
নীল নহে, স্বপ্ন নহে, বাস্তবের তটে
রূঢ় পাথরের স্তূপ আছে প্রকাশিয়া
বর্বর, কর্কশ, দীর্ণ তৃষ্ণায় ফাটিয়া।
মিথ্যা কথা! স্বপ্ন দিয়ে চাহ ভুলাইতে
বাস্তবের তীব্র তৃষ্ণা। চাহ দুলাইতে
মিলনের দোলা রিক্ত বিরহের শাখে।
জীবন মেরুর সূর্য—কি বিশ্বাস তাকে?
নাহি আলো, নাহি তাপ, মরণের শীত
সকল সান্ত্বনাচ্ছেদী, মর্মঘ্ন, নিশিত॥

১৯৩৮

মৃত্যুবৈতরণী

মৃত্যুর নির্ঝরবেগে জীবন-উপল
নিত্যকাল সঞ্চালিত
উপত্যকা-পথে।
ঘর্ষণ-সঞ্জাত তার সংগীত বিপুল
ভাসে বায়ুস্রোতে—
ক্রমনিম্ন ধাপে ধাপে বাহি সানুদেশ
কুহেলিত দিগন্তরে নদী নিরুদ্দেশ।

সে নদী পড়ে না চোখে, কুহেলিবসনে
ঢাকে সন্তর্পণে,
ধূমল সে মল্‌মলে সূর্য দেয় সোনা,
চাঁদের রজতে বোনা
আধাআধি তার,
ইন্দ্রধনু দেয় তাহে রেশমের পাড়।

দিগন্তের ধনুশ্চ্যুত দমকা বাতাসে
অকস্মাৎ আন্দোলিত পাইনের বন,
একটানে খসে যায় মুখোশ হাসির।
মিথ্যা হাসি, মিথ্যা শোভা,
মিথ্যা সব গণি,
খড়্গানীল, মৃত্যুহিম বহে বৈতরণী॥

১৯৩৮

অর্ধনারীশ্বর

বিভূতিভূষণের স্মরণে

তুমি ছিলে প্রকৃতির নিজহাতে গড়া,
তাই বসুন্ধরা
অবারিয়া দিয়াছিল রহস্য অপার
নয়নে তোমার।
তুমি তার
কক্ষে কক্ষে করেছ ভ্রমণ
আপনার জন।
যেন কোন্ জন্মান্তের স্মৃতিসূত্র হাতে
আসিলে ধরাতে,
সবই পরিচিত সম প্রকাশিল নয়নে তোমার,
নদী গিরি বন,
দিগন্ত অপার,
মানুষের মন,
পল্লীর অঞ্চলে বাঁধা স্নেহের নবনী,
কোমলে ললিতে পূর্ণ মানুষের হৃদয়ের খনি।
সবারে দেখেছ তুমি জন্মান্তের বান্ধবের প্রায়
অন্ধ এ ধরায়।

তব চিত্তবিনির্গত বিচিত্র বন্যায়
রচি দিয়া পলির প্রলেপ,
ক্ষুধাতৃষ্ণা, যত না আক্ষেপ
জীবনেরে নিরন্তর করে উদ্‌বেজিত,
তাহাদের করিলে ললিত,
করিলে মধুর,

তাই তব সুর
স্পর্শ যেন আপন বন্ধুর,
তাই তো তোমারে
একেবারে লভিয়াছি হৃদয়ের ধারে
যেথা জাগে আশা চিরন্তনী,
প্রেম অনশ্বর,
অম্বর অবনী
রচে যেথা সর্বমনোহর
অপূর্ব বাসর।

অপূর্ব পথিক,
তব যাত্রা-দিক্
আশায় উজ্জ্বল করি দেখেছিলে তুমি,
বনভূমি
মাতৃক্রোড় সম দিব্য পেতেছে অঞ্চল,
পাহাড় ডেকেছে তোমা দুই হাত তুলি,
রহস্যের ঝুলি
অবারিত করিয়াছে গিরির কন্দর,
ধূর্জটির জটাভ্রষ্ট এসেছে নির্ঝর,
খেলার সে সাথী তব
নব নব
ছন্দ রচি তরল কল্লোলে
সে যে ছুটে চলে।

আজ হতে হবে সখা তার স্নিগ্ধ সুর
দ্বিগুণ মধুর,

নবীন বধূর
আধেক ভাষণ যথা কঙ্কণের কুণ্ঠিত ঝংকারে।
তুমি তারে
ভাষা দিবে, সে দিবে রাগিণী,
সে যে বিবাগিনী
আর
তুমি যে বিবাগী,
লবে মাগি
এইখানে ক্ষণিক আশ্রয়।

ঐ হেরো ছায়া নামে পাহাড়ের উচ্চ চূড়া হতে
বন্য যত কিরাতের প্রায়,
এখনি ভরিয়া দিবে এ উপত্যকায়।
শাল পিয়াশাল যত দীর্ঘ ছায়া হানে,
পরাজয় মানে
মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র অরণ্যের কাছে।
জনহীন চতুর্দিক্, তবু কারা আছে
অদৃশ্য অস্তিত্বে যেন সর্বত্র ভরিয়া
নিশ্বাস ধরিয়া,
শব্দহীন চতুর্দিক্, তবু সব করে গম্ গম্,
সংগীত চরম
শেষ সপ্তকের অন্তে অকস্মাৎ গিয়াছে জমিয়া,
অনাহত বীণাতন্ত্র রণিয়া রণিয়া
মরে অন্বেষিয়া
স্মৃতি আর প্রতিধ্বনি হারানো সম্পদ।

ঝী-ঝী-করা তরুপুঞ্জ স্তব্ধ পারিষদ
এইমাত্র সব যেন উঠেছে দাঁড়ায়ে,
গ্রীবাটি বাড়ায়ে
দেখিবারে চাহিতেছে সভাস্থলে প্রবিষ্ট সম্রাটে।
হেরো নিম্নে মাঠে
বিবর্ণ আলোর শব ছায়াদল লইয়াছে কাঁধে,
নির্ঝরিণী কাঁদে
কল্লোল-বিলাপে।
কার অভিশাপে
অকাল সায়াহ্ন হেথা,
বাখানিবে কে তা।
হেথা কেন নিসর্গের স্বতন্ত্র নিয়ম,
বিচার-বিভ্রম।

কার সন্ধ্যা কোথা নামে কে বলিতে পারে।
বৃহৎ ধরারে
আলো আর ছায়া দোঁহে কি পর্যায়ে করিছে বেষ্টন
সমগ্রেরে যে করে দর্শন,
চির-সন্ধ্যা, চির-প্রাতঃ, চির-আলো, চির-অন্ধকার!
পূর্বাহ্ণ সায়াহ্ন যত অপরাহ্ণ আর
বাহুতে বাঁধিয়া বাহু সর্বত্র সদাই।
কোথা হেন ঠাঁই,
যেথা নাই
আলো আর আঁধারের মিশ্র সঞ্চরণ।
এই তো জীবন,
এই তো মরণ!

জীবন-মৃত্যুর সূত্রে দোরোখা বসন।
এক ভাঁজে মৃত্যু তার, জন্ম অন্য ভাঁজে,
রহে না যে
এক ভাঁজে স্থিতি তার কভু।
তবু
জেনে শুনে কাঁদে প্রাণ
অবোধ সমান।
হয়তো বা
বোবা
মুগ্ধচিত্ত মানুষের এই বা নিয়ম,
বিচার-বিভ্রাম।

নামুক সায়াহ্ন ঘোর অরণ্যশয্যায়,
তিমির-সজ্জায়
ঢেকে দিক
দিগ্‌বিদিক্।
ওই গিরি, ওই চূড়া, ওই নিম্ন মাঠ,
অরণ্য জমাট
নিঃশেষে মুছিয়া যাক কালির প্রলেপে।
এতক্ষণ ছিল ক্ষেপে
হে-উত্তরে হাওয়া
বন্ধ করে দিক তার মত্ত তরী-বাওয়া।

অরণ্যের অবচ্ছেদে যেটুকু আকাশ
আপনারে করে সপ্রকাশ
কতটুকু আলো সেথা, কতটুকু আশা।
সে যেন রে আঁধারেরি আধো-আধো ভাষা।

সে যেন রে অধরের ঈষৎ কম্পন,
প্রিয়ের প্রমত্তশ্বাসে সে যেন রে চকিত গুণ্ঠন।
মৃত্যুর নিমীল নেত্রে সে যেন রে জীবনের শেষ চন্দ্রকলা,
বলার মুমূর্ষু বৃন্তে অনন্ত না-বলা।

আরো ঘনতর হোক নিবিড় আঁধার
দ্যুলোক-ভূলোক-ব্যাপী বিস্তৃত পাথার
ব্যাপ্ত করে দিক সব।
শুধু ওই রব
তমস্তলবিচারিণী চঞ্চলা নদীর
কাঁদুক অধীর।
রূপ্ রস গন্ধ স্পর্শ সব যাক মুছে
একেবারে ঘুচে,
শুধু শব্দময়ী,
অয়ি
একপুত্র হে জননী,
অসীমের প্রান্ত ঘেঁষে সকরুণ বিলাপের ধ্বনি
লোকে লোকান্তরে দিক শোকের গৌরব,
ব্যথার সৌরভ
অনন্ত আকাশতল করুক বিমনা।

আর কোনোদিন সখা আসি যদি হেথা,
জাগিয়া কি উঠিবে না সুগভীর ব্যথা
সদ্য-সুপ্তোত্থিত মুগ্ধ
অহল্যা সমান,
ক্ষুব্ধ
মোর প্রাণ

আরো কিছু খুঁজিবে সে!
তপস্বিনী মহাশ্বেতা-বেশে
ওই যে ঝরনাধারা ঝরে অবিরল,
পাথরের বক্ষ হতে
আনিতেছে সুধাস্রোতে
বেদনা উচ্ছল।
নামহীন ফুলে ফুলে
উঠিতেছে কেঁপে দুলে
কার যেন নয়নের জল।
মেঘ সম অরণ্যানী পাহাড়ের গায়,
ঘনতর কার যেন আকুল ব্যথায়।
এই বনভূমি, আর এই নির্ঝরিণী
আজি বিরহিণী,
তবু সে বিরহ কেন অব্যক্ত মধুর।
সখা, তব সুর
সংসার-উপরিতলে ভাসমান
পদ্মের সমান,
তব প্রাণ
তব সখ্যরস
এ সবারে করিয়াছে
উন্মনা বিবশ,
ভরিয়াছে
শূন্য দিক্ দশ।
তাই আজি শুনিতেছি
বেদনার পায়ে পায়ে
অদৃশ্য নূপুর,

তাই আজি শুনিতেছি
অরণ্যের ছায়ে ছায়ে
ঝিল্লি সুমধুর,
ব্যথাইয়া উঠিয়াছে জনহীন হেমন্তের নিঃশব্দ দুপুর।
বেদনার ভাঁজে ভাঁজে
বিরহের মাঝে মাঝে
তুলিতেছে বিন্দুগুলি নন্দন-মধুর।
বাহিরে যা শূন্য হল
তাই দিয়ে ভরা যেন প্রকৃতির শূন্য অন্তঃপুর।

তোমারে দেখেছি যবে
হেরিয়াছি তব দুটি চোখে
নির্মল আলোকে
অরণ্যের ছায়া আর
পর্বতের মায়া আর
অলক্ষ্যের কায়া আর
প্রকৃতির ঘনীভূত রূপ।
আজি, সখা, তোমার স্বরূপ
সর্বত্র ছড়ায়ে আছে,
লতায় জড়ায়ে আছে,
ভূতলে গড়ায়ে আছে,
দেহ-ধূপাধার-দীর্ণ
ব্যক্তিত্বের ধূপ
আবিষ্ট করেছে আজি সমস্ত ভুবন;
তাই এই বন
আনন্দভবন,

তাই এই গিরি,
বক্ষ যার চিরি
বাহিরায় শুভ্র প্রস্রবণ
সংগীত-প্রবণ,
তাই মোর শোক
অনিন্দ্য আনন্দ-বৃন্তে অশ্রুঘন বেদনার শ্লোক।

মানুষেরে প্রকৃতিরে
মৃত্যু দিয়ে ঘিরে
করেছ নিবিড়তর হে বন্ধু আমার।
চিরন্তন বিরহ তাহার,
উভয়ের সঙ্গ লাগি উভয়ের মত্ত হাহাকার,
তব সাধনায়
আজিকে মিলায়,
আজি কি হয়েছে তারা যুগল-নির্ভর
অর্ধনারীশ্বর!

কবে তারা হবে সখা অর্ধনারীশ্বর?
প্রকৃতি মানুষে মিলে
এ নিখিলে
রচিবে বাসর?
উত্তরী-অঞ্চলে কবে
প্রেমগ্রন্থি বাঁধা হবে?
জটায় মিলিবে কেশ, ললিতে কঠোর,
উদ্ভাসিবে অর্ধনারীশ্বর।
ধনুকে মিলিবে বীণা, বল্কলে অম্বর,
পোহাইবে বিরহ দুস্তর।

কবে হবে ফলশ্রুতি, তপস্যা দুশ্চর,
পূর্ণ রূপে দেখা দিবে অর্ধনারীশ্বর ?

তুমি তারি অগ্রদূত, হে আনন্দময়,
মৃত্যুর এ নান্দী তব ব্যর্থ নয় নয় !
জীবনমৃত্যুর ডোরে
বাঁধিয়াছ দৃঢ় ক'রে
প্রকৃতিরে মানুষেরে তুমি,
তাই বনভূমি
মানবিত,
আর নিত্য দেখা দিত
তব চোখে
বিশ্বাসের নির্মল আলোকে
প্রকৃতির ছবি !

তাই কবি,
আজি হতে এই অরণ্যানী
বিতরিবে বাণী
অব্যক্ত মর্মরে,
বিমল নির্ঝরে
তোমার প্রসন্ন হাসি উঠিবে উচ্ছলি অনুক্ষণ ;
যবে অন্যমন
আপন ছায়ারে লয়ে করি বিচরণ,
তখন সহসা
বৃন্ত হতে অতর্কিতে খসা
অদৃশ্য স্বরূপ তব পড়িবে সম্মুখে,
তুলে লব বুকে,

বিস্ময়ের সে আনন্দ করিবে প্রকাশ
নিত্যরাস
প্রকৃতি ও নর ;
আজি আর ভিন্ন নয়,
পরস্পরে ছিন্ন নয়,
রচিয়াছে অনন্ত বাসর
অর্ধনারীশ্বর ॥

১৯৫০